Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501086 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Landscape and Poetic Map: The Aristocratic Formation of 'Kurundogai'
ভূখণ্ডের চিত্রপট এবং কবিতার মানচিত্র: 'কুড়ুন্দোগৈ'এর আভিজাতিক রূপনির্মাণ

Shambhunath Karmakar Research Associate and
Dr. Senthil Prakash Selkutti, Associate Professor
Tamil Department
Visva-Bharati

Received on: 29th April 2026
Accepted on: 12th May 2026

Abstract:
In the topographical landscape of India, a pattern of unity amidst diversity is clearly discernible. We observe a reflection of this collective map within the realm of Indian literature as well. Within the external ambience of Tamil Sangam literature, the underlying internal and emotional context that comes to light is of profound significance. The blended realization of geographical boundaries and a unified poetic consciousness is truly enchanting.

Key Words:
Kuruntokai, Imagination, Figure of Speech, Landscape, milieu

মূল প্রবন্ধ

ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিবর্তন এবং সংস্কৃতির রূপান্তরে প্রাদেশিক সাহিত্যের আধুনিকীকরণ কতটা কার্যকর হয়েছে তা পটভূমি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই অবগত। সমগ্র ভূখণ্ড হিসাবে ভারতবর্ষের পরিচয় ভারতীয় সাহিত্যেই প্রতিফলিত। ভাব ও রূপগত ঐশ্বর্যে তামিল সঙ্গাম সাহিত্য ভারতবর্ষের মিলনসংগীত। সংস্কৃত সাহিত্য যখন প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠের স্তরে অবলীলায় নতুন নতুন আধুনিক ভাষার প্রাথমিক খসড়া রচনা করছে তার বহু আগে প্রকীর্ণ শ্লোকসম্ভার নিয়ে সঙ্গাম সাহিত্য হাজির হয়েছিল ভারতীয় সাহিত্যের আঙিনায়। কিন্তু আর্য সভ্যতার বহুধাব্যাপ্ত বিশ্বপরিচয়ের কাছে তার রূপনির্মিতি হয়ে গিয়েছিল পরিম্লান। উনিশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা এর জন্য কম দায়ী নন। আলব্রেখট ওয়েবার কিংবা মরিস উইনটারনিৎজও সুবিশাল ভারতীয় সাহিত্যের মূল্যায়ন করে গিয়েছেন সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের আশ্রয়েই। বিস্তৃত অঞ্চল বা কালগত ব্যাপ্তির দিক থেকে ভাবলে সঙ্গাম সাহিত্য কোনোদিনই ভারতীয় সাহিত্যের মূলধারার আলোচ্য হয়ে উঠত না। ভাষা-সাহিত্যের সমীকরণ অপরিহার্য ছিল বলেই তুলনামূলক সাহিত্যচর্চায় তার অভিনব অন্তর্ভুক্তি। বহু ভাষায় রচিত সাহিত্যই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। সুকুমার সেন যখন পরবর্তী সংস্করণে 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' বইটির নামকরণ করলেন 'ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস' তখন এই সংহতির সত্যিটাই প্রকাশিত হলো। অথচ 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' বইটির 'ভূমিকা'য় কৈফিয়ৎ-হিসাবে লিখেছিলেন, "এখনকার দিনের ব্যবহারে ভারতীয় মানে Indian আর ভারতীয় সাহিত্য

© Santiniketan Sahityapath

মানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচিত সাহিত্য। এই অর্থ সাহিত্য অকাদেমি সমর্থিত বটে। আমি কিন্তু সে অর্থে ভারতীয় সাহিত্য বলি নাই। যে সাহিত্য কোন বিশিষ্ট প্রাদেশিক ভাষায় লেখা নয়, যে সাহিত্য এমন ভাষায় লেখা যা কখনো কোন প্রদেশ বিশেষের সম্পত্তি ছিল না, যে ভাষা অনেক প্রদেশেরই ব্যবহার্য ছিল এবং যে ভাষার সাহিত্য ভারতবর্ষের সব প্রদেশের সমান অধিকার, অর্থাৎ বৈদিক, সংস্কৃত, বৌদ্ধসংস্কৃত, পালি, বিভিন্ন প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ — এই সব প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত সাহিত্যবস্তুর কথাই বলিয়াছি।”[১] কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার অন্যত্র, যাঁদের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের সমার্থক ছিল না তাঁরাও ভারতীয় সাহিত্যের একটি অতি-নির্ধারিত ধারণা ভাগ করে নিয়েছিলেন — যা সমস্ত বৈচিত্রকে উপেক্ষা করে বৌদ্ধিক, নীতিগত এবং নান্দনিক ঐতিহ্যের আধিপত্য দাবি করেছিল। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের একটি সমত্বময় গুরুত্বপূর্ণ ধারণা রয়েছে — যে-ধারণাটি অভ্যন্তরীণ সুষমায় উদ্ভূত এবং উপস্থাপিত হয় যা বিভিন্ন ধরনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি জানায়। যার নিজস্ব চরিত্র ও মেজাজ রয়েছে। এবং ভাষাগত, জাতিগত, ধর্মীয় সীমানা অতিক্রম করে কিছু চিরন্তন বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে। এই সামূহিক ঐক্যের ধারণা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়াজনিত ফলশ্রুতি নয় কিংবা জাতীয় আন্দোলনের সুবাদে সংগঠিত নয়। যে-কোনো আঞ্চলিক সাহিত্য সংস্কৃতর মতোই শিষ্ট এবং লৌকিক — এই দুটি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভারতীয় ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ভারতীয় জনগণের ঐক্যের অনুভূতি প্রবল এবং সেইজন্য ভারতীয় সংস্কৃতি একাধারে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক, আচার-অনুষ্ঠানগত এবং সমুন্নত মার্জিত আচরণের বিভিন্ন কারণ থেকে উদ্ভূত। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এই উদারনৈতিক চেতনা ভারতীয় জীবনচর্যায় প্রবাহিত।

কবি বিদ্যাপতির মাতৃভাষা মৈথিলী হলেও আরো দুটি ভিন্ন ভাষায় সাহিত্য-চর্চা করেছেন। বহুভাষিকতা তাঁর শিল্পিব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্তরায় না হয়ে বরং দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুকূল হয়েছিল বলেই আমরা তাঁর বহুমুখী সারস্বত সাধনাকে সাদরে স্বীকৃতি জানিয়েছি। এরপরেও যাঁরা ভাষাগত রাজনৈতিক মতপার্থক্যে আস্থা রাখেন তাঁরা উন্নাসিক বৈকী! তাই শিশিরকুমার দাশ যখন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন তখন সামগ্রিক বিচারে ষড়যন্ত্রকারী রাজনৈতিক মতাদর্শকে সজ্ঞানে পরিহার করেছেন।[২] কিন্তু মনে রাখতে হবে, সাহিত্য অকাদেমি গঠিত হওয়ার বছর দুই পরে (১৯৫৬) তামিলনাড়ু (তৎকালীন মাদ্রাজ) থেকে তেলেগুভাষী অন্ধ্রপ্রদেশকে পৃথক করা হয়েছিল শুধুমাত্র ভাষাগত রাজনৈতিক ভিত্তিতেই। তামিলের মতো অন্যান্য প্রধান ও প্রাচীন ভাষার ভিত্তিতে যদি রাজ্য-পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়েছিল তাহলে ভারতবর্ষের অন্তঃসীমানার বিপুল পরিবর্তনকে স্বীকার করতেই হয়। সুনির্দিষ্ট ভাষার সাহিত্য নাকি ভারতীয় সাহিত্য — কোনটি গণচেতনায় সুপ্রযুক্ত হয়ে নান্দনিক পরম্পরাকে বাহিত করবে বলা মুশকিল। বহুত্ব এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে যে-সংগত প্রশ্নটি উঠে আসে জনৈক সমালোচক সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে তারই জোর-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন —

> **গত জানুয়ারিতে, তামিল লেখক পেরুমল মুরুগন তীব্র অভিমানে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি আর সাহিত্য রচনা করবেন না, কারণ তাঁর ‘মদুরুবাগান’ (২০১০) উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ One Part Woman নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছে তামিলনাড়ুর গোষ্ঠীবিশেষের কাছ থেকে। কিংবা এই সেদিন বাংলাদেশে মুক্তচিন্তার লেখক অভিজিৎ রায়ের নৃশংস হত্যার ঘটনা। সাহিত্যকে কিছু লোক এত ভয় পায়? এত ঘৃণা করে? দোষটা কার? সাহিত্যের, না আমাদের? এ সব প্রশ্নই আমাদের নিছক বিদ্যানির্ভর আলোচনাচক্রের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চায়।**[৩]

শিল্পী-সাহিত্যিক যদি দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্যকে ব্যাহত না করে বিভিন্ন বিষয়, রূপ ও শৈলীকে অবলম্বন করে একাধিক ভাষায় নিজেকে অবলীলায় প্রকাশ করতে পারেন তাহলে তা হবে একই সাহিত্য-জগতের অন্তর্গত। আমরা কবিমনের অনুভূতিপুরুষকে খুঁজি; ভাষাস্বরূপকে নয়। একক মনের প্রকাশতত্ত্বেই বৈশ্বিক ধারণা সঞ্চারিত। সঙ্গাম সাহিত্যের ‘কুড়ুন্দোগৈ’ সংকলন থেকে যে-কবি-সংসদের পরিচয় পাই তাতে সমষ্টিচেতনার পরম্পরায় ব্যষ্টিমনের সুষম অভিব্যক্তি পরিস্ফুট। এপারে বসে-থাকা কবি কীভাবে ওপারের সুর শুনবেন — এটি বিপুলা পৃথিবীর কাল-নিরবধি চেতনাকেই উজ্জীবিত করে। একটা সময় বাংলার বায়রন, বাংলার মিলটন, বাংলার শেলি নামে উদীয়মান বাঙালি কবিদের আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু একই কালে আলাদা ভূখণ্ডের অধিবাসী দুজন কবি-মানুষের

© Santiniketan Sahityapath

সাক্ষাৎকার বা পরস্পরের রচনা-পরিচয়হীন অবস্থায় যদি ব্যাপক সাদৃশ্য দেখা যায় তাহলে সাধারণের মনে এরকম পোশাকি ধারণা গড়ে ওঠে। এসব ভেবেই রবীন্দ্রনাথ 'ঐকতান' কবিতায় লেখেন —

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি —

'কুড়ুন্দোগৈ'এর কবিরাও বিশ্ববোধে সমুন্নত হয়ে 'সর্বানুভূতি'র একরূপতাকে প্রতিভাসিত করে তুলেছেন। বৈষ্ণব পদাবলির রসপর্যায়ের মতো এই সংকলনে কবিতাগুলিকে পটভূমি-অনুসারে পাঁচটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধর্মীয় অনুষঙ্গ-বর্জিত সুকুমার বস্তুনিষ্ঠ কবিতার ভাবকেন্দ্রে ব্যক্তিগত মরমি অনুভব বিবর্তিত। জঙ্গাম-মিলিউ-এর মায়াবী রহস্যে গীতিকবিতার শিশিরবিন্দুটি একটি ধানের শীষে টলমলপ্রায়। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে ধর্মপুজোর জন্য শিবের বিচিত্র পুষ্পচয়ন থেকে শুরু করে উনিশ শতকে দেবেন্দ্রনাথ সেনের দেশি-বিদেশি পুষ্পপ্রীতির কথা বাংলায় সুবিদিত। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যনামের মধ্যেই ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কালীন নীলক্ষেত, রমনার বাসায় মোহিতলাল যে কতরকমের ফুলের চাষ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। 'কুসুমের মাস'এর কবি অজিত দত্তের নামও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'কুড়ুন্দোগৈ'এ ফুলের প্রাচুর্য যেমন আছে তেমন তার আলংকারিক সাংকেতিকতার বৈচিত্রও উপস্থিত। সংকলনের প্রারম্ভে সংযোজিত 'মরুগনের বন্দনা'টি বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের কথা মনে করায়। তবে স্বপ্নাদেশ বা প্রচারসর্বস্ব উদ্দেশ্যসাধনের আড়ম্বর নেই। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কবি মুরুগনের স্তুতিমালা রচনা করেছেন। পরিশেষে দুঃখ-পরিত্রাণ এবং ইচ্ছাপূরণের অভিলাষ ব্যক্ত করে তাঁর জয়গান গেয়েছেন। সমগ্র সংকলনের বেশ কিছু কবিতায় নায়িকা, সখী বিপদের আশঙ্কায় দেব মুরুগনকে স্মরণ করে মিলনের পথটি সুগম করবার তাগিদ অনুভব করেছে। প্রসঙ্গত বলা ভালো চিরকুমার কার্তিকের দৈহিক গঠন এবং ভূষণ-বসনের সঙ্গে মুরুগনের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কান্দল্ বা রক্তকাঞ্চন ফুল মুরুগনের পাহাড়ি-অধিবাসকে ঘিরে প্রফুল্ল রমণীয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি আভাইয়ারের 'আত্তিচূড়ি' কাব্যনামটিও বাউহিনিয়া বা কাঞ্চনতরু-সংশিষ্ট। 'আত্তি' বলতে কাঞ্চনতরুকেই বোঝায়। সেই কাঞ্চনের বিবিধ প্রকার — রক্তকাঞ্চন, পীতকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, দেবকাঞ্চন প্রভৃতি। এবং এই বাউহিনিয়া বা কাঞ্চন ফুল পৌরাণিক ঐতিহ্য-অনুসারে দেবাদিদেব মহাদেবের সঙ্গে জড়িত — যিনি এই ফুলের মালা পরে কণ্ঠ সুশোভিত করতেন বলে মনে করা হয়।

নবম-দশম শতাব্দীর আলংকারিক রুদ্রট তাঁর 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে মহাকাব্য ও লঘুকাব্যের বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে " 'লঘু'কাব্য মানে একটিমাত্র শ্লোকের 'মুক্তক', দুই শ্লোকের 'সন্দানিতক', তিনের 'বিশেষক', চারের 'কলাপক', পাঁচ থেকে চৌদ্দ পর্যন্ত শ্লোকের 'কুলক' হতে 'মেঘদূত'-এর মতন খণ্ডকাব্য পর্যন্ত হালকা কাব্য।"[৪] 'কুড়ুন্দোগৈ'এ কবিতার সর্বনিম্ন চরণ-সংখ্যা চার এবং সর্বোচ্চ নয়। সে-হিসাবে এটি লঘুকাব্য-সংকলন। ভাবগত বিচারে আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে খুব একটা তফাত নেই। নায়িকার রূপ-গুণের উৎকর্ষ বোঝাতে এবং প্রেমের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় স্থানে স্থানে ব্যতিরেক অলংকারের প্রয়োগ অভিনব।

পাহাড়ি পরিবেশের কুড়িঞ্জি-বিষয়ক কবিতাগুলিতে ফুলের বৈচিত্র সবচেয়ে বেশি। নীলগিরি নামটিই নীলাভ কুড়িঞ্জির তাৎপর্যবাহী। প্রতি বারো বছর অন্তর দলবদ্ধভাবে এই ফুল ফোটে এবং বিস্তীর্ণ পার্বত্য এলাকাটিকে নন্দনকানন-অমরাবতীর মতো সাজিয়ে তোলে।[৫] স্থানীয়রা মনে করেন যখন কুড়িঞ্জি ফোটে তখন সময়ও থমকে যায়। প্রখ্যাত তামিল ঔপন্যাসিক না। পার্থসারথির 'কুড়িঞ্জি মালার' উপন্যাসটি সঙ্গাম যুগের প্রেম ও নিসর্গপ্রীতির স্নিগ্ধমধুর পরিবেষ্টনকে অবলম্বন করেই লিখিত। উপন্যাসের বিষয়টি অবশ্য স্বাধীনতা-উত্তর সমাজমানসের পরিচায়ক।

পথচারী মানুষের গানে বাল্যখেলার আনুষঙ্গিক উপাদান হিসাবে উঠে এসেছে কম্পমান শিরীষ বীজক,

বাঁকমল পরে ধনুক ও শরে যায় যে ছেলেটি দূরে
মেয়েটিও তার পিছু পিছু ধায় চুড়ি-নূপুরের সুরে।

কুলীন ঘরের ছেলেমেয়ে ওরা ছুটছে দিগ্বিদিকে
রজ্জুনৃত্যে বাজিছে বাদ্য বেণুর বৈতালিকে!
কাঁপায় সুধীর শিরীষ বীজক দেখি তাই অনিমিখে।[৬]

সেকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলোয় ছাড় পেত, সানন্দে ঘরকন্না করত, সম্প্রতি ঘরকুনো হয়ে থাকাটাই অলিখিত বিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় সমাজে 'ক্রীড়াকৌতুক' কথাটির প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে। যিনি পরমপুরুষ তিনিও বিশ্বচরাচরকে নিয়ে নিয়ত কৌতুকের ছলে খেলা করছেন। 'কুড়ুন্দোগৈ'এর কবি নিশ্চয় নজরুলের মতো আধ্যাত্মিক ভাবাবিষ্ট ছিলেন না।

দড়িনাচ ছাড়াও 'কুড়ুন্দোগৈ'এ 'তুণঙ্গো' নামে এক শ্রেণির পথনৃত্যের উল্লেখ আছে। আজকালকার হিপ হপ, ব্রেকিং, পপিং, লকিং-এর মতো স্ট্রিট ড্যান্স নয়; পথনাটিকার মতো অভিনয় এবং নাচগানের জোড়াতালি দিয়ে পরিবেশিত এক অনন্য পথপ্রদর্শনী। এ-প্রসঙ্গো কেরালায় 'থেইয়াম' প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ্য। রাত্রির অন্ধকারে দেদীপ্যমান আলোয় উদ্ভাসিত জমকালো পোশাক ও উজ্জ্বল মুখোশ-পরিহিত অভিনেতারা যেভাবে দেবতাদের আহ্বান করেন তাতে ধ্যাননিবিষ্ট বিমূর্ত সাধনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এবং তাঁদের এই পরিবেশন 'সাংস্কৃতিক পথনৃত্য বা দেবতাদের পথ' নামে অভিহিত।

ফসলবিলাসী মাঠের ধারে কাঞ্চি ফুলের বাহার এবং বিভাষী ভডগর জাতির মেয়েদের খোঁপায় কাঞ্জা ফুলের বেণীবিভঙ্গা লোকায়ত জীবনের চিত্ররূপ। দীর্ঘ বিরহের যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে নায়িকা পোড়ামনকে প্রিয়তমর কাছে নিয়ে যেতে বলেছে। সে এক আলাদা ভূখণ্ড, দেশের মধ্যে আরেকটি দেশ। বাঙালিরা যখন 'দেশের বাড়ি' যাব বলে তখন ব্যঞ্জনায় যে-ভূখণ্ড চেতনার পরিচয় পাই এখানে তারই আশাবাদ সূচিত। দেশ ছাড়িয়ে বহুদূরে কট্টি দেশ — অবন্ধুরা সেখানে ওত পেতে থাকে, দুর্ধর্ষ সৈন্যদের অতন্দ্র প্রহরায় সে-দেশ সদাজাগ্রত। একটু আগে আমরা 'পোড়ামন'এর কথা বলেছি; তার সঙ্গো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ রাধার বিরহব্যাকুল অভিব্যক্তির তফাত সামান্যই,

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজণে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।।

মধ্যভারতে প্রচলিত প্রবাদমালায় এই কথাটিই উচ্চারিত হয়েছে — "বন পোড়ে সবকই দেখে অন্তর পোড়ে কইনা না দেখে।"[৭] 'লালন-গীতিকা'তেও এই আক্ষেপের সুর অনুরণিত —

বন পোড়ে তো সবাই দেখে
মনের আগুন কেবা দেখে[৮]

মনের অন্তরলোকে আরেকটি প্রদেশ আছে যেখানে জীবনদেবতার অধিষ্ঠান। উৎসবে-আয়োজনে তাঁকে ধরা যায় না, চেনা যায় না, রূপকের মধ্যে উদ্ভাসিত সত্যস্বরূপ তিনি। জল-মাটি-আলো-বাতাসের পরিমণ্ডলে যে-ভূভাগ আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে অন্তরের অন্তঃপুরকে তো এরকম কোনো ভৌগোলিক আবহ কিংবা অন্তঃসীমা-রেখায় চিহ্নিত করা যায় না। একঘন অনুভূতির প্রকাশেই সে বিশ্বের পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে। 'কুড়ুন্দোগৈ'এর ভূসংস্থানিক বলয়ে আবর্তিত যথাক্রমে বাসনালোক, স্মৃতিলোক এবং অন্তরলোক। মানবচিত্তের অন্তঃসলিলা গূঢ় সংস্কারই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করেছে।

'সেই দেশেরই নায়ক আমার' — সমৃদ্ধশালী নগরের বর্ণনা দিয়ে নায়িকার আবেগমন্দ্রিত উচ্চারণ ধ্বনিত করে নাগরিক সভ্যতার দেশটিকে। শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, মার্জিত রুচি এবং পরিশীলিত বেশভূষায় যত্নবান নাগরিকরা বৈদগ্ধ্যের পরিপোষক। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের চমৎকারিত্ব নিশ্চয় আছে কিন্তু সেগুলিকে অতিক্রম করে গিয়েছে নাগরিকতা এবং গ্রামীণ কৃষ্টির আভিজাত্য। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'এ গৃহস্থ নাগরিক জীবনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'বই পড়া' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী তারই ব্যাখ্যা লিখেছেন, "সংস্কৃত বিদগ্ধ

শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এ দেশে পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, একালে আমরা যাকে সভ্য বলি সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে synonyms"[৯] সমুদ্রের তীরে কুলেখাড়া শাকের কাঁটাগুলিকে কাঠবেড়ালির দাঁতের সঙ্গো তুলনা করে 'কুড়ুন্দোগৈ'এর কবি সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন।২২০ সংখ্যক কবিতায় বনবিড়ালের হাসির সঙ্গো কুন্দকুসুম ফুটে ওঠার অদ্ভুতোপমাটি এ-প্রসঙ্গো স্মরণীয়। পরবর্তীতে অসম্বন্ধে সম্বন্ধ স্থাপন করে মহাকবি কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে এধরনের অতিশয়োক্তির চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের পদাবলিতে এই অসম্ভের বৈচিত্র আরো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী... ' হোক কিংবা জগদানন্দর 'দশন কুন্দকুসুমনিন্দু বদন জিতল শারদ ইন্দু' — আলংকারিক ঐশ্বর্যে সাধারণ লোকায়ত জীবন ও নৈসর্গিক পটভূমি ম্লানায়মান হয়ে পড়েছে। অলংকারের ভারে বস্তুগত উপাদানটি যেন কোথাও চাপা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু 'কুলেখাড়া শাকের কাঁটা'র সঙ্গো 'কাঠবেড়ালির দাঁত'কে সহজে মেলাতে পেরেছি বলেই উপমার রমণীয়তায় দুটি সাধারণ বিষয় অসাধারণত্ব লাভ করেছে। ৬৮ সংখ্যক কবিতায় মাষকলাইয়ের শিকড়ের সঙ্গো কোকিলের নখের উপমাচিত্রণ এই শ্রেণির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

নায়িকার চুলে মোসাম্বি ফুলের সুবাস কিংবা পদ্মরেণুগন্ধ প্রথাগত ভারতীয় কাব্যিক চিত্ররসের প্রতিভাস। আধুনিক কবি জীবনানন্দর কবিতাতেও চিত্রকল্প ও পরাবাস্তবতার আশ্রয়ে তার পরম্পরা রক্ষিত হয়েছে। আবার বনের দেশের প্রতীক্ষারত অসুখী নায়িকার নায়ককে ভেষজ গুণসমৃদ্ধ ওষধি ('கல்கெழு கானவர் நல்குறு மகளே'.) বলে কল্পনা করার মধ্য দিয়ে লৌকিকতার উপর আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আরোপ সুনিশ্চিত করেছে। দাশরথি রায়ের একটি পদগান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে উদ্ধৃত করছি —

পীতবাস বড় তাপিত, দেখিলাম উদর স্ফীত —
উদরি সন্দেহ নাই তাতে।
হয় বা বঁধুর প্রাণদণ্ড, পথ্য তাতে মানখণ্ড
ব্যবস্থা হয়েছে ওগো রাই।।
আছে যেন প্রস্তুত ঘরে, শীঘ্র মান চূর্ণ ক'রে
অগ্রে দাও...

লোকায়ত জীবন ও চরিত্রের উপর শাস্ত্রীয় বস্তুর ব্যবহার-আরোপের মধ্য দিয়ে এখানেও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। মানবিক গুণবিশিষ্ট স্বভাবের সূক্ষ্মসুকুমার বিবরণ থেকেই এ জাতীয় রূপকল্পের উদ্ভব।

নুয়ে-পড়া বেণুবন যখন হাওয়ার বেগে হঠাৎই সিধে হয়ে যায় তখন বাঁধা ঘোড়া ছাড়া পাওয়ার সঙ্গো কবি তার তুলনা করেন। কবির উদ্ভট কল্পনায় বিরহী প্রেমিকের চেহারা তুলনীয় হয় গ্রীষ্মকালের ষাঁড়ের সঙ্গো। উঠে আসে পাটলি নগরের পার্শ্ববর্তী শোণ নদের কথা। তার তীরের সকল সোনা দিয়ে নায়িকা প্রিয়তমকে খুশি করতে চায়। শ্মশানের দেশ ছেড়ে লবণ-বণিক যখন মরু পথে পাড়ি দেয় তখন চিন্তিত নায়িকার হৃদয়-মন্দির শূন্য বলে মনে হয়। আর তখন কবিতাকে নিছক কোনো ভৌগোলিক পটভূমির সীমাবদ্ধতায় আবৃত করে রাখা সম্ভব হয় না। ভাবসামর্থ্যে সে অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের আস্বাদনযোগ্য রমণীয় বৃত্তান্তে পরিণত হয়। অতলস্পর্শী বিরহের তীব্রতায় সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানও যেমন রিক্ত-মলিন হয়ে ওঠে, ধূ ধূ মরুও তার স্বভাবধর্মে অবিচল থেকে সেই বিরহলীন ধূসরিমাকেই নিঃস্বতায় আচ্ছন্ন করে। সুজলা সুফলা 'মারন্দৈ' পুরীতে অনিন্দ্যকান্তি প্রেমিক যখন সহচরীকে নিয়ে পথ হাঁটে তখন আপন দেশে মর্মাহত নিঃসঙ্গা প্রেমিকার বিরহের বিভাবরী কাটে। 'মেঘদূত' নিবন্ধে ইংরেজ কবির (ম্যাথু আর্নল্ড) বক্তব্য-অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

> **দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এক কালে আমরা এক মহাদেশ ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত,**

© Santiniketan Sahityapath

> **অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে প্রবাসীরা আপন আপন পথিকবধূর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান।**[১০]

'কুড়ুন্দোগৈ'এর কবিতার পর্যায়বিন্যাসকে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড-চেতনার রূপায়ণ বলে মনে হলেও ভাবগত ঐক্যে তা দীপ্র অনুভূতিময় অন্তরলোকের একঘন নির্যাসের অখণ্ড শৈল্পিক লিপিকা।

মরুভূমির (পালৈ) দুর্গম পথে যাত্রা করে নায়ক সমৃদ্ধশালী দেশ থেকে বিপুল উপার্জন-শেষে ফিরে আসে স্বদেশে। বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কীভাবে সে দুস্তর পথ অতিক্রম করে লক্ষ্যপূরণে সফল হয়েছে সখীর কাছে তার বিবরণ দেয়। এই বিবরণের মধ্যে বিপদসঙ্কুল দুরূহ মরুপথের কথাই ঘুরে ফিরে আসে,

পায়ে পায়ে পথ ছোটো হয়ে যায় এই তো জীবন, সখী
পড়েছিল কত উপত্যকায় কাঁচা মিঠে আমলকী!
পেরিয়ে এলাম আলোয় আঁধারে যেখানে বাঘের ভয়,
থমকে দাঁড়ায় কঠিন সময় ফেলে-আসা পরিচয়।
ফিরে এসে দেখি উড্ডীন পাখি বঁইচি ফুলের ঘ্রাণ,
শাখায় শাখায় পুষ্পিত কুঁড়ি সুবাসিত অম্লান,
আকুল চুলের খোঁপায় সাজানো ঈপ্সিত অভিমান।[১১]

রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ কিন্তু অভিমানী প্রিয়তমার মানভঞ্জন করা সর্বাপেক্ষা দুরূহ কাজ।

সম্পদ অর্জনের জন্য দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে নায়ক প্রিয়তমাকে কিছু জানায় নি। গল্পটা একই ভূখণ্ডের তবু অধুনা প্রবাসী সাধের প্রেমিক না জানিয়ে ভিন দেশে চলে গেল — এটাই নায়িকার মনে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। সত্যিটাকে তার মন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না,

না বলে সে চলে যাবে — তাও কি সম্ভব?
তুমিই এখন বিচার করো হে মহানুভব!
মহুল-শাখে ডাকছে বসে দলছাড়া ওই শ্যেন,
সারি সারি পাহাড় ভারী পাথুরে লেনদেন।
সে পথ দিয়ে গেছি আগেও পায়ের চিহ্ন রেখে
অজানা নয় কিছুই আমার স্মৃতিকণা মেখে!
বলেছিল শুভাকাঙ্ক্ষী 'ঠকেই মানুষ শেখে।'[১২]

শুভাকাঙ্ক্ষীর বচন খনার বচনের মতোই। প্রতারিত এবং পরাজিত হয়ে যে-শিক্ষা লাভ করা যায় তা অমূল্য।

'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'র চরম দশা 'কুড়ুন্দোগৈ'এর কবিতায় প্রবাদবাক্যে রূপায়িত। তামিল সঙ্গম সাহিত্যে কাম ও প্রেমের ভেদ নেই। কামের কথা শুনলেই পড়শিরা নিন্দামন্দ করে কিন্তু তারা কামের স্বরূপস্বভাব জানে কি?

বয়সকালে গাভীর যেমন সয় না পেটে তৃণ,
প্রস্ফুটিত ঘাসের মতো কামও তেমন জেনো;[১৩]

শাস্ত্রীয় বোঝাপড়ায় কামের নৈতিক এবং অনৈতিক গুণাবলীর বিচার করাই যায় কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সেই কামই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে শুচিস্নিগ্ধ প্রেমের সংস্কারে পরিণত হয়। শরীর ও মনের সংস্কার-সঞ্জীবিত কামনার সমুন্নত প্রতীতিই প্রেম — যেন বিম্ব-প্রতিবিম্বর রূপান্তর-লীলা।

মুরুগনের মতো কালীও সঙ্গাম সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছেন। বিদ্যাসুন্দরের মিলনে যেমন কালিকা সহায় হয়েছিলেন 'কুড়ুন্দোগৈ'এর নায়ক-নায়িকার বহুপ্রতীক্ষিত মিলনতিথির শুভক্ষণে কালী মায়ের কাছে পুজো দেওয়ার কথা উঠে এসেছে। তবে মঙ্গালকাব্যের মতো সঙ্গাম সাহিত্য দেবতার প্রচারসর্বস্ব উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হয়ে থাকে নি। প্রকীর্ণ গীতিকবিতায় মানবীয় প্রেমের রোমান্টিক আখ্যানই মুখ্য বিষয়রূপে উপস্থাপিত। সংকেতস্থানে নায়িকা আসার আগেই নায়ক এসে পড়ায় সময়ের গরমিলে অপেক্ষমাণ নায়ক অবশেষে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। নায়িকা ভেবেছে সে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সখী তাকে চোখ আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে —

ফুলের দলে রথের চাকার দাগ সে গেছে রেখে,
এসেছিলেন প্রমাণ তারই সোনালি উল্লেখে।[১৪]

রোজগেরে নায়কের কথা মনে পড়লেই নায়িকা তার দেশের পরিচয় দেয়। দেশের মধ্যেই আরেকটি দেশ — সমুদ্রমেখলা ঘিরে রেখেছে যাকে নীলাভ শুভ্রতায়;

পরদেশী প্রিয় আমার সাগরপারে বাস
ঊর্মিমুখর সুখের কিনার কেয়াফুলের রাশ।
পল্লবিত নিশীথবেলা কল্লোলিত সীমা —
সারস পাখির ডানার মতো শুভ্র শ্যামলিমা।[১৫]

নায়কের পক্ষ থেকেও এরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। বস্তুগত এবং মনোগত সম্পদে ঋদ্ধ প্রিয়ার দেশের কথা বলতে গিয়ে নায়ক নিজেই বিস্মিত হয়। ভারতবর্ষ যে ভূমিলগ্ন কৃষিসভ্যতার ধারক এবং বাহক — 'কুড়ুন্দোগৈ'এর কবি সে কথাই স্মরণ করিয়েছেন। এ-দেশের গ্রামীণ কৃষ্টির আভিজাত্য উৎসবের বিকৃত উল্লাসকে নয়, আনন্দের নিষ্যন্দ-ধারাকেই বহমান রেখেছে —

সারথি আমার পরম মিত্র এসেছি প্রিয়ার দেশে
ফসল-তোলার সমারোহ দেখে খুশিতে গিয়েছি ভেসে।
উপড়ে পড়েছে কন্দমূলের সুগন্ধি অবতল
সাজানো সোনার অযুত মোহর সিন্দুকে উজ্জ্বল!
দরাজ-হাতের বিতরণ-পালা চুকিয়ে তাহার পিতা
ব্রাহ্মণদের বিলিয়ে শস্য সর্বহারার মিতা!
কাঁকনের মতো নমনীয় হৃদি প্রেয়সী অনিন্দিতা।[১৬]

জি. সি. শার্য়িপ কবিতার দুটি বৃহত্তর পটভূমি চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও মানব-চরিত্রচিত্রণের স্বরূপসম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। একটি উন্মুক্ত প্রকৃতির রাজ্য, অন্যটি উদার মানবচরিত্র। প্রাচীন তামিল কবিতার অভ্যন্তরীণ উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈসর্গিক বিষয়গুলি পরিণয়ের ভাবসুষমাকে অভিব্যক্ত করেছে। এম. বরদারঞ্জনের মতে, "The Sangam poets work in both the great fields, and it is, therefore, that the reader finds in their poems what Palgrave would characterise as the marriage of Man with Nature. These two subjects are interwoven as warp and woof in the fine tapestry of ancient Tamil poetry. The ancient poets have united the power that observes the phenomena of external Nature with an insight into human feelings as either influenced or affected by them."[১৭] উদাহরণস্বরূপ তিনি কপিলরের লেখা 'কুড়ুন্দোগৈ'এর ২৪৯ সংখ্যক কবিতাটির প্রাঞ্জল গদ্যানুবাদ করে প্রাকৃতিক ভূচিত্ররস এবং মানবিক জীবনরসের পরস্পর পরিপূরকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা মূল তামিল থেকে কবিতাটির স্বকৃত পদ্যানুবাদ উপস্থাপন করছি —

বাতাসে আজ কেকাধ্বনির আগমনী গান
শায়ক-বেঁধা পাখির মতো ছটফট করে প্রাণ।
বৃষ্টিবাদল ঝড়ের মুখে ভীত বানরছানা

বসে আছে জবুথবু নেই কোনো ঠিকানা,
পাহাড় দেখে মনে পড়ে প্রেমিক দিওয়ানা।

নায়িকার স্মৃতিলোকে আলম্বন বিভাবকে নিয়ে রোমন্থন চলছে। স্মৃতির উদ্দীপক পাহাড় এবং স্মৃত বিষয়টি নায়ক। স্মৃতির পরিবেশটি সর্বস্ব বা মুখ্য হয়ে ওঠে নি বলেই ‘মনে পড়ে’ ক্রিয়াটি সাদৃশ্যাত্মক দুটি বিজাতীয় বস্তুকে ব্যঞ্জনাসুন্দর করে তুলেছে। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের বিখ্যাত পদটি এ প্রসঙ্গো স্মরণীয়,

কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।।

পাহাড়ের সমুন্নত মহিমা, তার বিস্ময়জাগানো চমৎকৃতি নায়িকার স্মরণপথে নায়কের চিত্রচরিত্রকেই উদ্ভাসিত করেছে। প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যে প্রতিবিম্বিত মানবীয় প্রেমের আলোকসুষমা কবিত্বের লাবণ্যে পূর্ণ। কবিতাটির স্বল্প পরিসরে চিত্ররসের সৌকর্য-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচক মন্তব্য করেছেন, “Here the great poet Kapilar depicts the passion of the heroine and at the same time paints a mountain scenery with rain and peacocks and langurs.”[১৮] ‘কুড়ুন্দোগৈ’এর বেশিরভাগ কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির মায়াবী মন্থনে সুধা-সুনিবিড় বিরহানন্দের সঞ্চার লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে অন্যতম ইডৈক্কাডনারের লেখা ২৫১ সংখ্যক কবিতাটি —

গুমরে ওঠে মেঘের ভিতর অন্ধ আবেগলতা
বৃষ্টিভেজা মনময়ূরী সান্ধ্য নীরবতা।
আতাফুলের সুবাস-মাখা বাতাস মৃদুমন্দ
চৌকাঠে পা রাখলে যখন সিংদরোজা বন্ধ।
ভুল করে সেই পেখম-মেলা শাওন ধারাপাতে
নৌকাভাসান দেখবে বলে বর্ষাঋতুর হাতে
সঁপে দিলে নভোনীলে বৃষ্টিবিহীন রাতে।[১৯]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘যখন বৃষ্টি নামল’র সঙ্গো এর কতটুকুই বা তফাত! বিচ্ছেদকাতর নায়িকার মনের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে সখীর জবানিতে কবি অনিন্দ্যসুন্দর বর্ষাকাব্য লিখে ফেলেছেন।

‘অগম’ পর্যায়টি প্রেমানুভূতির আন্তরিক বা মানসিক অবস্থাকেই সূচিত করেছে। যে-পাঁচটি পৃথক ভৌগোলিক পরিবেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই প্রেমের কবিতাগুলি মানবজীবনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বনির্ভর নান্দনিক রহস্যকে প্রকট করে তুলেছে তার যথার্থ পরিচয় ভাবগত ঐক্যের সংস্থানিক অবয়বে নিহিত। একটি বৃহৎ ভূখণ্ডে পৃথক পৃথক পরিমণ্ডলের আবহ-নির্মাণের গুরুত্ব কোথায় — সেটিকেও স্পষ্ট করেছেন কবিরা। জলবায়ু পরিবর্তন এবং আবহমণ্ডলের ভিন্নতার কারণে ক্রমাগত জীববৈচিত্রের বিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে চলেছে। বহু আগে সঙ্গাম সাহিত্যের কবিরা তা আঁচ করতে পেরেছিলেন,

> **The geographic control of life and growth is an idea recently reached by science and newly expounded in treatises on Anthropogeography. But the ancient Tamil poets have somehow understood this influence of natural environment on the life of men and have established conventions in their works especially on love and its various aspects. These conventions prove that ancient Tamil poetry was inspired by acute observation of Nature and its influence on human life in its different aspects.**[২০]

রাজা দোবরু পান্নার মতো কত রাজা-মহারাজা কালের অতলে হারিয়ে যান। ইতিহাসে তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। ‘কুড়ুন্দোগৈ’এ সুমহান রাজা সেনথন, অত্যাচারী রাজা নান্নান, তোন্ডাইয়ের দানশীল রাজার কথা জানতে পারি; আর আরকাদ রাজ্যের

© Santiniketan Sahityapath

রূপবতী মেয়ের ব্যক্তিত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। প্রকৃতির অনাবিল লীলাছন্দে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাপন তানলয় ও সুরের অনুপম রসায়ন,

বইছে বাতাস মন্দমধুর ভোমরা আপন তানে
গুনগুনিয়ে ফোটায় কুসুম রাতের অবসানে।
শিথিল হয়ে হাতের কাঁকন দুলছে বাহুমূলে
সরোবরে বকের সারি উড়ছে হেলেদুলে।
ইরম্মদের অধিকারী তোন্ডাইয়ের রাজা
পাহাড় ঘিরে নাগকেশরের বাহারি সং-সাজা!
চালতে গাছের ছায়ায় বসে দলছাড়া এক গাভী,
আসবে ফিরে প্রিয়তম শুনবে তোমার দাবি।[২১]

বিরহবেদনার তীব্রতা এমনি যে নায়িকার খাবারেও রুচি নেই, পার্থিব কোনো বিষয়েই তার আসক্তি নেই। অথচ নায়ককে না দেখে সে মরবার কথাও ভাবতে পারে না। শীর্ণ-ক্ষীণ বাহুলতায় অঙ্গাদ-বলয়-ভূষণ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। বিস্রস্ত কেশ, ক্লান্ত অবসন্ন শরীর আর শ্লথ বাহুবন্ধনীর ব্যঞ্জনা প্রিয়-অপেক্ষায় লীন। পরের কবিতাটি একই গোত্রের এবং ভাব ও রূপনির্মাণশিল্পে বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের পদাবলির থেকে কোনো অংশে কম নয় —

বুলিয়ে দেয় শীতের পরশ ঘুম আসে না চোখে,
মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে কোন্ সে স্বপ্নলোকে!
কষ্ট সয়ে নষ্ট হয়ে তিল ফুলেরই বীজে
হৃদয় আমার তাকায় ফিরে সাধে মনসিজে।
বৃষ্টি এখন রিমিঝিমি মঞ্জীর-পায়ে নাচে,
প্রস্ফুটিত তিলের কুসুম, মহিষও ডাকে কাছে।
বন্ধ কপাট অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই ঘুম,
বুকের ভিতর তোলপাড়-করা হাম্বা-ডাকের ধুম।[২২]

মনসিজের কাছে প্রেমিকার একান্ত প্রার্থনা নায়ক যেন প্রবাস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। সংকোচ, ভয়, বাদল দিনের নৈসর্গিক বিপর্যয়, দুর্যোগকে মাথায় করে প্রেমিকার অতন্দ্র রাত্রিযাপন — সবই মিলনপিয়াসী হৃদয়ের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় প্রলিপ্ত। আলগা হাতের চুড়ি আর ভাঙা-চুড়ির ব্যঞ্জনা সঙ্গাম কবিতায় ভিন্ন মাত্রায় প্রতিভাসিত। সংস্কৃত কবিতার সঙ্গো প্রাচীন তামিল কবিতার ধ্বননক্রিয়ার তুলনাত্মক আলোচনা-প্রসঙ্গো জর্জ এল. হার্ট 'কুড়ুন্দোগৈ'এর ৩০৭ সংখ্যক কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ-সহ তার ব্যঞ্জনাব্যাপারের সূক্ষ্ম পার্থক্যটি আধুনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন,

Like a broken bangle,
the crescent moon has appeared in the red sky
for men to worship.
Has he forgotten me?
He left me to weep
and goes on long, barren paths
where an elephant,
not bearing to see the suffering of his mate
staggering as she walks,
gores a high ya tree so it is ruined.

© Santiniketan Sahityapath

takes its white fibrous bark with his trunk,
tastes it.
and trumpets, his heart filled with pain.

জর্জের মতে দক্ষিণ ভারতের মেয়েরা যখন বিধবা হন, তখন সেই সদ্যবিধবার সত্তাজুড়ে যে বিপজ্জনক শক্তি ভর করে, তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁদের চুড়িগুলি ভেঙে ফেলা হয়। 'বিপজ্জনক শক্তি' বলতে জর্জ কি কোনো প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশুভ শক্তির কথা বলতে চেয়েছেন নাকি স্বামীহারা শোকবিহ্বল মেয়েটির 'বাতুল' অবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন — তা স্পষ্ট নয়। তবে কবিতাটির সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনাকে তিনি যে-মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন তা এককথায় অসাধারণ।

In this poem, the crescent moon suggests a broken bangle to the woman whose lover has left to find wealth: an object that is normally so auspicious that men worship it suggests to her the most inauspicious of all states, widowhood. The time that she sees the moon is the evening, when all activity ceases and the anguish of night is anticipated, the time when the suffering of women separated from their lovers is most acute, at least con-ventionally in Tamil. Then the heroine describes the wilderness to which her lover has gone. An elephant tries to help his suffer-ing mate by feeding her bark, only to find that it is inedible. This suggests that the attempt of the hero to make his beloved's life pleasant by bringing home wealth will miscarry; wealth cannot be enjoyed in the same way as union, to which eating is often compared. The poet also wishes to liken the heroine herself to the gored tree: the hero, he suggests, has tasted her sexually, ruining her in the process, found her unpalatable, and abandoned her.[২৩]

'কুড়ুন্দোগৈ'এর প্রেমের কবিতাগুলির প্রায় প্রতিটি চিত্রকল্প এবং উপমায় বিশিষ্ট প্রতীকী তাৎপর্য আছে। এবং প্রতীক ও সাংকেতিক অভিব্যঞ্জনার পারস্পরিক ক্রিয়া পাঠকের মনে এমন অনুরণন সৃষ্টি করে যে সেগুলি অখণ্ড রূপকল্পের ব্যঞ্জনাশক্তিতে রমণীয় বৈচিত্রময় হয়ে ওঠে। সেইজন্য রূপকল্পের গভীরে যত প্রবেশ করা যায় তত বেশি অভিনব-মনোরম বিষয়ের সাক্ষাৎ মেলে।

প্রাকৃত ভাষায় লিখিত অতিক্ষুদ্র লঘু কবিতার সঙ্গে তামিল সঙ্গম সাহিত্যের বেশ কিছু প্রকীর্ণ কবিতার স্থান ও কালগত অব্যাপ্তির দোষ-গুণের বিচার করে উপমা বা চিত্রকল্পের মূল্যায়ন করাই যায়। কিন্তু সে-মূল্যায়নে ভারতবর্ষের বৃহত্তর ভূখণ্ডের লোকায়ত জীবনের সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা কতটুকুই বা উত্থাপিত হবে! তামিল সাহিত্যে ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিতধর্মিতা প্রায়শই প্রাকৃত সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি জটিল। এই জটিলতার একটি প্রধান কারণ হলো — যে-পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল এবং সেগুলি লিখেছিলেন এমন সব পরিশীলিত মার্জিত রুচিসম্পন্ন মর্মজ্ঞ কবি, যাঁরা তাঁদের জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে কাব্যচর্চা করেছেন এবং এমন কাব্যরীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যা বহু বছর ধরে পরিমার্জিত ও অধিকতর সূক্ষ্ম রূপ লাভ করেছিল। তাঁরা প্রায়শই ত্রিশ বা চল্লিশ পংক্তির কবিতা রচনা করেছেন, যেখানে বহুবিধ অলংকার বা চিত্রকল্পের প্রয়োগ ঘটেছে। সেগুলির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এমন সব ব্যঞ্জনাময় আবহ নির্মিত হয়েছে, যার সম্ভাব্য বিন্যাস বা রূপভেদ কার্যত অনির্বচনীয়। অন্যদিকে, প্রাকৃত কবিতাগুলি বেশিরভাগই সংক্ষিপ্ত এবং সেগুলিতে সচরাচর একটির বেশি চিত্রকল্পের উপস্থিতি দেখা যায় না। তামিল কবিতার অধিকাংশ রচনার তুলনায় প্রাকৃত কবিতাগুলিকে লোককাব্যের অনেক বেশি কাছাকাছি বলে মনে হয়; আর ঠিক এই কারণেই সেগুলির আঙ্গিক ও ভাব অত্যন্ত সরল। অবশ্য হাতেগোনা কয়েকটি তামিল কবিতাকে অন্যদের তুলনায় লোককাব্যের আদর্শের অধিকতর নিকটবর্তী বলে প্রতীয়মান হয়; প্রাকৃত কবিতার সমগোত্রীয় রচনার সঙ্গে সেগুলির সাদৃশ্য সত্যিই লক্ষণীয়। ভাষিক প্রেক্ষাপটে তামিল ও প্রাকৃত কবিতায় ব্যঞ্জনা-প্রয়োগের মাত্রাও ভিন্ন। জর্জ সেটির নিপুণ যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও সংস্কৃত ও প্রাকৃত — উভয় ভাষাগোষ্ঠীতেই ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত-এর প্রয়োগকৌশলের উৎস অভিন্ন, তবুও কেন তামিল ভাষায় তার ব্যবহার ভিন্নতর — তা অনুধাবনের প্রচেষ্টায় যে কারণটি সবার আগে এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, তা হলো দ্রাবিড় ভাষাসমূহের তুলনায় আর্য ভাষাসমূহের স্বতন্ত্র প্রকৃতি;

© Santiniketan Sahityapath

তামিল ভাষা ব্যঞ্জনার বিকাশ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী, অথচ প্রাচীন ইন্দো-আর্য ভাষাসমূহ সে-ক্ষেত্রে ততটা উপযোগী নয়। জর্জ লিখেছেন —

> **In Tamil, it is difficult to make two or more long adjectival subordinate clauses modify the same noun. The reason for this is that in Tamil such clauses must be turned into phrases ending in adjectival participles. For example, "the chair in which I am sitting" would be nan uşkürntirukkira närkäli (literally "the I-am-sitting chair"). The adjectival participle must ordinarily modify the word that immediately follows it. Thus it is often impossible to translate literally into Tamil two adjectival subordinate clauses modifying the same word by using adjectival participles, which are the only Tamil forms that are reasonably close to the Indo-European adjectival subordinate clause.**[২৪]

তামিল কবিতার মুখ্য বিষয়-বিভাজনে 'তোল্কাপ্পিয়ম'-অনুসৃত 'অগম' ও 'পুড়ম' নামে দুটি বিভাগকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এবং সেই 'তোল্কাপ্পিয়ম'ই পাঁচটি ভূভাগ-নির্ভর যাবতীয় প্রেমের কবিতার ধারা নির্দেশ করেছে। 'তোল্কাপ্পিয়ম' শুধু ব্যাকরণ-বিজ্ঞানশাস্ত্র হয়ে থাকে নি; হয়ে উঠেছে কাব্যসৌন্দর্যবিজ্ঞান এবং তামিল সমাজজীবনের প্রামাণ্য দলিল। এস. এন. কান্দাস্বামী 'তোল্কাপ্পিয়ম' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত আলংকারিক ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গো সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনায় সূত্রনির্দেশ-পদ্ধতির অনুসরণ করে মূলতত্ত্বের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন। ভূখণ্ড-চেতনায় অধ্যুষিত 'কুড়ুন্দোগৈ'এর কাব্যিক জগতটি আপাতদৃষ্টিতে (অভিধা) ভিন্নধর্মী — কারণ ভূভাগ-পরিদৃশ্যের বৈচিত্রে কবিতার রূপগত আবেদনও পৃথক পৃথক আশ্রয়ে উপভোগ্য কিন্তু কবিতায় সমুদ্ভূত বিরহ-মিলন-অপেক্ষা-ক্ষণিক বিরহ-মিলন বা বিচ্ছেদের অন্তর্লীন আবহে ব্যঞ্জনাঋদ্ধ ভাবগত অভিনিবেশের ব্যাপারটি সমগ্রতায় উন্নীত। মনোবিজ্ঞানের জগৎ থেকেই কাব্যসৌন্দর্যবিজ্ঞানের উদ্ভব। যে-বস্তুকে (অচেতন হোক বা সচেতন) মন সানন্দে স্বীকৃতি জানায়, আত্মা যাকে শুচিতায় অধিকার করে তা-ই সুন্দর। পাহাড়, বনানী, সমুদ্র, কৃষিক্ষেত্র বা ধূ ধূ মরুভূমি পূর্বোল্লিখিত কবিতার বিশিষ্ট ভাবসমূহের আবহ-সৃজনে সহায়ক নিশ্চয় কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এক ভূখণ্ডের রসানুরঞ্জিত অনুপম কাব্যপরিমল।

সহাকয়গ্রন্থ:

১। 'ভূমিকা', 'ভারতীয়-আর্য সাহিত্যের ইতিহাস', সুকুমার সেন, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২৫

২। 'Prologue', 'A History of Indian Literature', Vol 1, Sisir Kumar Das, Sahitya Akademi, Rabindra Bhavan, 35, Ferozeshah Road, New Delhi 110 001, Reprint 2005

৩। 'ভারতীয় সাহিত্যের পাঠ: কিছু প্রশ্ন', পবিত্র সরকার, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি', সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ২০২৪, পৃ. ১৯

৪। 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা', শ্যামাপদ চক্রবর্তী, কৃতাঞ্জলী প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩, পৃ. ৩১০

৫। ইউ. ভি. স্বামীনাথ আইয়ার 'কুড়ুন্দোগৈ'এর ৩ সংখ্যক কবিতাটির ব্যাখ্যায় কুড়িঞ্জি সম্পর্কে লিখেছেন, "They say that this [kuriñci] blooms once in twelve years, that the honey which bees make from its flowers is quite delicious, and that a tribe called the Totuvans who live in the Nilgiris reckon their ages by counting the number of times this plant has bloomed from birth." (Kuruntokai with U.V.Sa.'s Commentary, Editor: U.V.Swaminatha Iyer, Kesari Press, Chennai, 1937)

৬। 'কুড়ুন্দোগৈ' ৭

৭। 'মধ্যভারতে প্রচলিত প্রবাদ মালা', রেভারেন্ড কে. কে. জি. সরকার (সংকলক), এ. বি. মুখার্জি, ২৭ নং ওল্ড বৈঠকখানা সেকেন্ড লেন, কলকাতা, ১৮৯৪, পৃ. ৩১

৮। 'লালন-গীতিকা' (৩২৫), মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র (সম্পাদনা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮, পৃ. ২২৪

© Santiniketan Sahityapath

৯। ‘প্রবন্ধসংগ্রহ’, প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ. ১৪৬

১০। ‘প্রাচীন সাহিত্য’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২৬, পৃ. ১৫

১১। ‘কুড়ুন্দোগৈ’ ২০৯

১২। ওই, ২০৭

১৩। ওই, ২০৪

১৪। ওই, ২২৭

১৫। ওই, ২২৮

১৬। ওই, ২৩৩

১৭। ‘The Treatment of Nature in Sangam Literature', M. Varadaranjan, The South Indian Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Tinnevelly, 1/140, Broadway, Madras 1, First Published May 1957, p. 3

১৮। Ibid, p. 5

১৯। ‘কুড়ুন্দোগৈ’ ২৫১

২০। Ibid, p. 7

২১। ‘কুড়ুন্দোগৈ’ ২৬০

২২। ওই, ২৬১

২৩। ‘The Poems of Ancient Tamil: Their Milieu and Their Sanskrit Counterparts', George L. Hart III, University of California Press, Berkeley, 1975, p. 167

২৪। Ibid, p. 182

—